Vol. 60 | No. 3 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীর ক্ষমতায়ন: একটি পর্যালোচনা

Volume	60
Issue	3
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Shamima Nasrin
Published online	November 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i3.5
Pages	83-95
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা
Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.5
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ মার্চ ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৮৩-৯৫

বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীর ক্ষমতায়ন: একটি পর্যালোচনা

শামীমা নাছরিন
সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: shamima.nasrin@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

যে কোনো সাহিত্য ও ধর্ম-দর্শনে মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম-দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম-দর্শনে ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি সমাজে বসবাসকারী মানুষের যাপিত জীবনের নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর সেই আলোচনার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, এ সাহিত্য সমাজের নর-নারীদের জীবনবোধসহ বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ, যা বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি সময় উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীন ভারতে বুদ্ধযুগে গৌতম বুদ্ধ সকল মানুষকে সমানভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং সেটি অনুসরণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ করেননি। নারীদেরও তিনি আলাদাভাবে দেখেননি। তিনি নারীদের সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন, দিয়েছেন সকল প্রকার অধিকার। সংঘে প্রবেশাধিকার থেকে শুরু করে সমাজ, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রদান করেছেন সম-অধিকার। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে রাজ্য পরিচালনা থেকে শুরু করে ধর্ম প্রচার সকল ক্ষেত্রে নারী সগৌরবে কাজ করতে পেরেছেন। তিনি ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণাকে সারিপুত্র এবং মৌদগলায়ণের ন্যায় সম-অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। তিনি নারীদের সকল প্রকার নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নারী ও পুরুষকে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন ও উন্নয়নের সম-অংশীদারিত্বে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে সর্বদাই বলেছেন। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের জন্য বুদ্ধ নারীদের অনেক বেশি মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়ন, মর্যাদা, সম-অধিকার থেকে শুরু করে এ সম্পর্কিত নানা দিকের তথ্যানুসন্ধান উপস্থাপিত হয়েছে।

মূলশব্দ

নারীর ক্ষমতায়ন, বৌদ্ধ সাহিত্য, সংঘ, সম-অধিকার, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, থেরীগাথা, নির্বাণ।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানবসভ্যতার যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তা নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের যুগে আজ সৃষ্টিশীলতায় ও দক্ষতায় কারো অবদানকে ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। উভয়ের প্রচেষ্টার ফলেই পৃথিবী ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুই কারো একার প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছে। তবে স্থান-কাল ও পরিস্থিতিভেদে নারী-পুরুষের ভূমিকার ধরন ও মাত্রার পার্থক্য ছিল এবং আছে। সমাজের বা জাতির উন্নতির জন্য পুরুষের সাথে সাথে নারীরও যে ভূমিকা রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কেননা নারীকে উপেক্ষা করে কোনো জাতিরই উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। কেননা নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে নিয়েই সমাজ গঠিত। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সাম্য এসবের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদান। প্রাচীনকালে নতুন আলোকবর্তিকা নিয়েই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের আগমন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের আগমনে নারীর প্রতি বৈষম্য অনেকাংশে কমে যায়। মানবতা ও মনুষ্যত্বের মহাজাগরণের অনন্য সাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ আরো অনেকে। সততা, উদারতা, ত্যাগ ও পরোপকারের মাধ্যমই গৌতমী সকলের হৃদয় জয় করেছেন। নৈতিক চেতনার দিক থেকে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। প্রকৃত আদর্শ জন্মে প্রাপ্ত হয় না, আদর্শ অর্জন করতে হয়। বুদ্ধ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের জন্য একটি আদর্শ নারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীর ক্ষমতায়ন' প্রবন্ধে সেই সকল বাস্তবতার তথ্যানুসন্ধান উপস্থাপিত হয়েছে।

বৌদ্ধ *থেরীগাথা* গ্রন্থে নারীর অবস্থান

ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মীয় পালি গ্রন্থের নাম (সুকোমল ও সুমন ২০০০: ১)। *ত্রিপিটক* বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল উৎসও বটে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ হলো *থেরীগাথা*। এই গ্রন্থে ৭৩ জন মহিলা ভিক্ষুণীর আপন আপন কর্ম ও কৃতিত্বের গুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ৭৩ জন থেরীর মধ্যে ২৩ জন রাজ পরিবারের বধূ ও কন্যা, ১৩ জন শ্রেষ্ঠী বা ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত, ৭ জন ব্রাহ্মণ ও পূজারী, আর ১৫ জন ছিলেন বারবনিতা। আর অবশিষ্ট ভিক্ষুণীরা সমাজের সাধারণ পরিবারভুক্ত গৃহস্থের মেয়ে (বেলু ২০০৪: ১১)। তাঁদের অন্তর জীবন মানবতার বেদীমূলে অর্ঘ্য-রূপে নিবেদিত। তাপিত প্রাণে শান্তির বারি, করুণার প্রতিমূর্তি। এ ছাড়াও সর্বজন বন্দিত হলেন এই ৭৩ জন থেরী বা ভিক্ষুণী। সর্বত্যাগীর সাধনক্ষেত্র হলো প্রাচীন ভারতবর্ষ। বৌদ্ধ সাহিত্যমাত্রই বৈরাগ্য প্রধান। সুতরাং সাংসারিক জীবনের প্রেম, ভালোবাসা, স্বভাব বর্ণন, বৈষয়িক অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এখানে লক্ষ করা যায় না (রবীন্দ্র ১৯৮০: ২৪৫)।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে ধ্যানমার্গ, মার্গফল, বিবিধ বিদ্যা, অভিজ্ঞা ও নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণে কোনো পার্থক্য বিবেচিত হয়নি। তাঁরা আন্তরিকতার সাথে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা করেছিলেন এবং ফল লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, ধর্মদিন্না ছিলেন স্বধর্মের সেবাপ্রাণা নিবেদিতা। তখনকার সময়ে রুক্ষ, শুষ্ক-জীবনে তাঁরা করুণাধারায় আবির্ভূত হলেন। মগধের রাজা বিম্বিসারের পত্নী

পরমাসুন্দরী ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টি লাভে সর্বপ্রধানরূপে স্বীকৃত হন। শ্রেষ্ঠী কন্যা উৎপলবর্ণা সাধনাবলে অর্হত্বফল লাভ করেন। এ ছাড়াও বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধিপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত হন। সুমেধা ছিলেন শীলাবতী, বাগ্মিনী, বহুশ্রুতা ও সুশিক্ষিতা। এমনকি পতিতারমণীরাও বুদ্ধ সংঘে যুক্ত হয়ে থেরী হয়েছিলেন। ভিক্ষুণীদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভদ্দা ও কুণ্ডলকেশীর জীবন বৃত্তান্তে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে নারীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। বৌদ্ধ মহীয়সী রমণীদের জীবনীগ্রন্থ *থেরীগাথা* সম্পর্কে T. W. Rhys Davids যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য:

> It affords a very instructive picture of the life the (Theris) led in the Valley of the Ganges in the time of the Gautama Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhists reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women (Davids 1910: 72).

অনেকে গৃহী জীবনে অবহেলিত ছিলেন; কিন্তু ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁদের সম্মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। থেরী পটাচারা ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়াও লক্ষ্য এক মনে হলেও কর্ম ও জীবনযাত্রার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিসাগৌতমী, বিমলা, আম্রপালি, অড্‌ঢকাসী, ইসিদাসী তাঁদের জীবন কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। *থেরীগাথা* গ্রন্থে থেরীদের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

'ভিক্ষুণীসংঘ' স্থাপনের ইতিহাসে প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা খ্যাত নারী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি ছিলেন দেবদহ[১] নগরের সুপ্রবুদ্ধের (সুপ্পবুদ্ধ) কনিষ্ঠা কন্যা ও মায়াদেবীর ভগিনী। মায়াদেবী ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্মলগ্নে ব্রাহ্মণেরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তাঁদের সন্তান চক্রবর্তী রাজা হবেন। শাক্য রাজা শুদ্ধোধন দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তাহকাল পরে মহামায়ার মৃত্যু হলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী কুমার সিদ্ধার্থের লালনপালনের ভারবহনের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নন্দের মাতা। জীবন ও জগতের যথার্থ স্বরূপ অপরিজ্ঞাত হয়ে তিনি সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাতা, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ও মাতামহীরূপে। তিনি ছিলেন একজন মহীয়সী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বা থেরী। মহাব্রত উদ্‌যাপনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কখনো দারিদ্র্য-জর্জর, আর্ত, সন্তাপে সান্ত্বনা, আবার কখনো প্রেমময়ী, সর্বজনপ্রিয় থেরী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। বৌদ্ধধর্মের প্রতি বা বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের প্রতি তাঁর অসাধারণ মমত্ববোধ, ভক্তি ও শ্রদ্ধা বৌদ্ধ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বৌদ্ধ সংঘের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁর জীবনকে করেছে মহিমান্বিত। তাঁর জীবন-ইতিহাস প্রীতিময়, হৃদয়গ্রাহী এবং আদর্শ স্থানীয়। চরিত্র ছিল অতি পবিত্র, মনোজ্ঞ ও মাধুর্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ নারীকুলের রত্ন। এ ছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মধ্যে তিনি অভিজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি সারা জীবন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম বৌদ্ধসংঘে নারীর প্রবেশাধিকারের অনুমোদন করেন মহামানব গৌতম বুদ্ধ।

'সংঘ প্রতিষ্ঠা' ও নারীর ক্ষমতায়ন

বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো 'বৌদ্ধ সংঘ'। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সুসংগঠিত করার জন্য এই সংঘ গঠন করেন। সংঘের পুরুষ সদস্যরা 'ভিক্ষু', মহিলা সদস্যরা 'ভিক্ষুণী' নামে পরিচিত ছিলেন। উভয়েরই সংঘের প্রতি আস্থা ও নিয়মকানুন মেনে চলা কর্তব্য ছিল। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম, বৌদ্ধধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল আধুনিক 'সারনাথে'[২]। প্রাচীনকালে এই স্থানটি 'ঋষিপতন মৃগদাব' নামে পরিচিত ছিল। মহাসত্যের সন্ধানে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর অবশেষে শুভ 'বৈশাখী পূর্ণিমা' তিথিতে শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ সম্বোধি জ্ঞান লাভ করে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর প্রথমে তিনি প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন দুই গুরুর স্মরণ করলেন। কিন্তু ধ্যানযোগে জানলেন তাঁরা আর ইহজগতে নেই। তারপর তিনি তার পূর্বতন পঞ্চশিষ্য যারা সুজাতার পায়েস গ্রহণে গৌতমের প্রতি রুষ্ট হয়ে ছেড়ে চলে যান, তাঁদের কথা স্মরণ করলেন। তখন তারা বারাণসীর মৃগদাব ঋষিপত্তনে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অষ্টম সপ্তাহে তিনি বারাণসী যাত্রা করেন। দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করে অবশেষে তিনি বারাণসীর ঋষিপত্তনে পঞ্চবর্গীয়দের নিকট উপস্থিত হলেন। পাঁচজন শিষ্য হল: কোণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্দিয়, অশ্বজিত ও মহানাম। তারাও গৃহত্যাগী হয়ে দুঃখমুক্তির অন্বেষায় ঋষিপত্তন মৃগদাবে দীর্ঘদিন কঠোর ধ্যান চর্চায় রত ছিলেন। বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর যখন পণ্ডিত ব্যক্তির সন্ধান করেছিলেন তখন জ্ঞানদৃষ্টিতে তিনি তাঁদের কথা অবগত হলেন। বুদ্ধ পাঁচজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকে তার সদ্ধর্ম দেশনা করলেন এবং তাঁরা দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষুত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধের ধর্মমত ছড়িয়ে পড়ে। ষাটজন ভিক্ষু মিলে একটি সংঘ তৈরি করে। বুদ্ধ এই ষাটজন ভিক্ষুকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন ধর্ম প্রচারের জন্যে।

বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত বাণীগুলো ৮৪ হাজার ধর্ম স্কন্ধে বিভক্ত। এই ধর্ম স্কন্ধের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে প্রথম ও শেষ বুদ্ধবাণী। যা বুদ্ধের জীবন দর্শন তথা মানুষের এক অমূল্য পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। বুদ্ধ বোধি বা সম্বোধি জ্ঞান লাভের অব্যবহিত পরেই পরিপূর্ণ আনন্দে বুদ্ধের মুখ থেকে যে দুটি গাথা উচ্চারিত হয়েছিল তা বৌদ্ধদের নিকট অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। বোধি লাভের পর বুদ্ধ বলেন,

> Anekajāti saṁsāraṁ sandhāvissaṁ anibbisaṁ,
> Gahakārakaṁ gavesanto dukkhā jāti punappunaṁ.
> Gahakāraka diṭṭho si puna gehaṁ na kāhasi,
> Sabbā te phāsukā bhaggā gahakūṭaṁ visaṅkhitaṁ.
> Visaṅkhāragataṁ cittaṁ taṇhānaṁ khayam ajjhagā. (Narada 1993:140)

> That is, through many a birth I wandered in saṃsara, seeking, but not finding, the builder of the house. Sorrowful is it to be born again and again. O house-builder! Thou art seen. Thou shalt build no house again. All thy rafters are broken. Thy ridge-pole is shattered. My mind has attained the unconditioned. Achieved is the end of craving (Narada 1993:140).

জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমণের পথে বুদ্ধ যে দুঃখভোগ করেছেন, সে কথাই এখানে উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ আয়তনের সংযোগের জন্য যে বেদনা বা অনুভূতি জন্মে তা থেকেই তৃষ্ণার উৎপত্তি। তৃষ্ণার ক্ষয় হলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাকে বলা হয় ‘সোপাদিসেস নির্বাণ’। ‘সোপাদিসেস নির্বাণে’র পরবর্তীতে যখন পঞ্চস্কন্ধ অবসান হয়, তখন তাকে ‘অনুপাদিসেস নির্বাণ’ বা ‘নিরুপাদিসেস নির্বাণ’ বলে। যা বৌদ্ধ সাধনার পরম লক্ষ্য। জ্ঞান, শক্তি ও কর্মদক্ষতার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। কেউ কেউ বিরাট শক্তির অধীশ্বর বিপুল অবদানের মাধ্যমে এ পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। কেউ আবার সীমিত শক্তি নিয়েও জন্মগ্রহণ করেন। যারা মহান ও উদার তাঁরা নিরহংকার। তাঁরা জীব ও জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। কেননা মনুষ্যত্বই মানুষের পরিচায়ক। বৌদ্ধধর্মে অতি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্বক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনেয্যিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্‌ঞূহীতি (ধর্ম্মরত্ন ১৯৪১: ৪১-৪২)। অর্থাৎ এ ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য, আত্মদর্শনীয়; এ ধর্ম পালনে কোনো কালাকাল নেই, এ শুধু মনের শুচি শুদ্ধতার উপরই প্রতিষ্ঠিত, এসো, দেখো, মনঃপুত হলে গ্রহণ করো (ধর্ম্মরত্ন ১৯৪১: ৪১-৪২)।

বুদ্ধের উদাত্ত আহ্বান মানুষের অন্তর আত্মাকে আকৃষ্ট করেছিল। মানুষ সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকে। মহামানব গৌতম বুদ্ধের ‘অহিংসা পরম ধর্ম’ এই সত্যের বাণী প্রচার করে মানবসমাজকে দিয়েছেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। এ ছাড়াও তাঁর অহিংসার বাণী মানুষকে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি গোটা মানবসমাজকে একটি সত্তা বলে উল্লেখ করেছেন। জৈন ধর্মের চব্বিশতম তীর্থংকর মহাবীরও নৈতিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও উনিশ ও বিশ শতকে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী অহিংসার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কেননা হিংসা মানবজীবনকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদের মূল কারণ জাতিগত ও ধর্মীয় পার্থক্য। স্বার্থান্বেষী মানুষ জাতিগত বিভেদ ও শ্রেণিগত বৈষম্য সৃষ্টি করে সংঘাত, সংঘর্ষ ও হানাহানির মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিতে চায়, মানবিক সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, তার সবচেয়ে বড়ো ধর্ম মানবধর্ম। আর বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন শাখায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করে মানুষ প্রমাণ করেছে তার শ্রেষ্ঠত্ব। দেশে দেশে কালে কালে মহামানবেরা সেই মানবতার জয়গানেই মুখর হয়েছেন। মানবসভ্যতার দুর্দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানবতারই জয় হয়েছে।

বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর পূর্বেই বিশ্বমৈত্রীর কথা বলে গেছেন। শ্রাবস্তীর একজন জটাধারী ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, এই দেখুন আমার জটাজুট। আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার ও সম্বোধন করুন। বুদ্ধ বলেন, জটা, গোত্র বা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ (জিনবংশ ২০১৭: ১৬৯)। পৃথিবীর সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে না। এ ছাড়া বুদ্ধের সংঘেও জাতিভেদ ছিল না।

যশোধারা সংঘভুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধের নিকট তিনবার প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি। বুদ্ধের বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী, যশোধারা ও অন্যদের সাথে বুদ্ধের নিকট গমনপূর্বক সংঘভুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করেন। বুদ্ধ অনুরোধ প্রত্যাখান করে বৈশালীতে গমন করেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও সহচারীগণ নিরুদ্যম না হয়ে কেশচ্ছেদন করেন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান করে বৈশালী পর্যন্ত বুদ্ধের অনুগমন করলেন। পরবর্তী সময়ে আনন্দের মধ্যস্থতায় বুদ্ধ তাঁদের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। এভাবে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উদ্যোগে মহিলারা সংঘে প্রবেশের অধিকার অর্জন করেন এবং জগতে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ সংগঠিত হয়। পরে গ্রাম, শহর ও জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। নারীজাতিকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে ভিক্ষুণীদের জন্য আটটি বিশেষ বিধির প্রবর্তন করলেন। যা পালি সাহিত্যে অট্ঠগুরুধম্মা (অষ্টগুরুধর্ম) (Kassyap 1956: 375, রবীন্দ্র ১৯৮০: ৮৭, Oldenberg 1995: 353-355) নামে খ্যাত। সে আট প্রকার গুরুধর্ম হলো:

১. বস্সসতূপসম্পন্নায ভিক্খুণীযা তদহূপসম্পন্নস্স ভিক্খুনো অভিবাদনং পচ্চুট্ঠানং অঞ্জলিকম্মং সমীচিকম্মং কাতব্বং।

অর্থাৎ, ভিক্ষুণীর উপসম্পদা লাভের বয়স শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও আজ মাত্র উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বন্দনা, অঞ্জলিকর্ম, সমীচিত কর্ম করতে হবে।

২. ন ভিক্খুনিযা অভিক্খুকে আবাসে বস্সং বসিতব্বং।

অর্থাৎ, যে স্থানে কোনো ভিক্ষু বাস করে না, এমন কোনো স্থানে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবেন না।

৩. অনদ্ধমাসং ভিক্খুনিযা ভিক্খুসঙ্ঘতো দ্বে ধম্মা পচ্চাসিতব্বা উপোসথপুচ্ছকং চ ওবাদূপসংকমনং চ।

অর্থাৎ, প্রতি পনেরো দিন অন্তর (পাক্ষিক) ভিক্ষুণীকে উপোসথ বিষয়ক প্রশ্ন ও উপদেশ দানের সময় ভিক্ষু সংঘ থেকে ভিক্ষুণীকে জেনে নিতে হবে।

৪. বস্সং বুথায ভিক্খুনিযা উভতোসঙ্ঘে তীহি ঠানেহি পবারেতব্বং দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসংকায বা।

অর্থাৎ, বর্ষাবাস সমাপ্ত করার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত বিষয় সম্বন্ধে প্রবারণা করতে হবে।

৫. গরুধম্মং অজ্ঝাপন্নায ভিক্খুনিযা উভতো সঙ্ঘে পক্খমানত্তং চরিতব্বং।

অর্থাৎ, গুরুধর্ম প্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট পক্ষকাল মানত্তব্রত পালন করতে হবে।

৬. দ্বে বস্সানি ছসু ধম্মেসু সিক্খিত সিক্খায সিক্খমানায উভতোসঙ্ঘে উপসম্পদা পরিযেসিতব্বা।

অর্থাৎ, দুই বছর যাবৎ ছয়টি বিষয়ে শিক্ষাসমাপনান্তে ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট উপসম্পদা যাচনা করতে হবে।

৭. ন ভিক্‌খুনিযা কেনচি পরিযাযেন ভিক্‌খু অক্কোসিতব্বো পরিভাসিতব্বো।

অর্থাৎ, কোনো ভিক্ষুণী কখনো কোনো ভিক্ষুর নিন্দা করতে পারবেন না।

৮. অজ্জতগ্গে ওবটো ভিক্‌খুণীনং ভিক্‌খুসু বচনোপথো, অনেবটো ভিক্‌খুনং ভিক্‌খুনীসু বচনোপথো।

অর্থাৎ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে পারবেন কিন্তু ভিক্ষুণীরা কখনোই কোনো ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে পারবেন না অথবা উপসথ ও প্রবারণার দিন স্থির করতে পারবেন না।

উপরের এই 'আটটি গুরুধর্ম' থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধ দূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কোনো রকমের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাতে না ঘটে, মূলত সেজন্য সংঘের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই এ নিয়মগুলো বেঁধে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে বলেছিলেন, হে আনন্দ, মানুষ যেমন পূর্বেই প্লাবনের আশঙ্কা করে প্রকার জলাশয়ের চারদিকে জল আবদ্ধ রাখার জন্য বাঁধ বেঁধে দেয়, আমিও সেরূপ নারীজাতির প্রব্রজ্যা গ্রহণ যাতে মর্যাদা লঙ্ঘন না করে সেজন্য পূর্বেই আমি ভিক্ষুণীদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আটটি গুরুধর্ম নির্দেশ করেছি। এ অনুশাসনগুলো তাদেরকে সারাজীবন পালন করতে হবে বলে বিধান দিয়েছি (Oldenberg 1993: 325-326)। সংঘে প্রবেশের পূর্বে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার অপরাধের দণ্ড হতে থেরী এবং ভিক্ষুণীরা মুক্ত ছিলেন।

নারীজাতির জন্য বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের পথ সুগম করেছেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। এ ছাড়াও অনেক বৌদ্ধ নারী সংঘে দীক্ষা গ্রহণ না করেও বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উন্নতি সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য আম্রপালী, বিশাখা, মল্লিকা, শ্যামাবতী, সুপ্রিয়া, কুঞ্জুত্তরা। এ ছাড়া আরো অনেক নারী বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নারী তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নিয়েছে কারো ইচ্ছা বা সহানুভূতির মাধ্যমে নয়, নিজের যোগ্যতার মাধ্যমে। কেননা নারী সহানুভূতি চায়নি, নারী চেয়েছে তার অধিকার। মানুষ হিসেবে পুরুষের সাথে সমতা, নারী ও পুরুষের সম্পর্কে যথার্থতা নারীর আহ্বান নয়, বরং এটি নারীর মানবিক ও প্রাপ্য অধিকার।

বৌদ্ধযুগে নারীর রাজ্যশাসন এবং নারীর ক্ষমতায়নের উদাহরণ

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, নারীও লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজ্যশাসনে রাজাকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন; তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই খুব বেশি আলোচিত হয়নি। নারী শুধু পারিবারিক জীবনেই নয়, কর্মজীবনেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাকে ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মানবসভ্যতা গড়ার পেছনে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। *ত্রিপিটকের* অর্ন্তগত জাতক সাহিত্য থেকে জানা যায়, ক্ষেত্রবিশেষে নারীও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন এবং রাজার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কুশ জাতকে বর্ণিত আছে, প্রভাবতীকে পিত্রালয় থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যাত্রাকালে কুশকুমার জননী শীলাবতীকে তাঁর অনুপস্থিতে রাজ্যশাসন করার জন্য অনুরোধ করেন; শীলাবতী এতে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন এবং রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন (সুধাংশুরঞ্জন ১৯৯৫: ৬১৪)। উদয় জাতকে উল্লেখ রয়েছে, কাশীরাজের পুত্র উদয়ভদ্রের সাথে তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী উদয়ভদ্রার বিবাহ হয়। উদয়ভদ্রের মৃত্যুর পর অগ্রমহিষী উদয়ভদ্রা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁর আজ্ঞায় অমাত্যগণ রাজ্যশাসন করতে থাকেন (ঈশানচন্দ্র ১৪২০: ৮২)। আর এক সময় বারাণসীরাজ এসুকারী রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করায় রাজপদ শূন্য হয়। এতে নাগরিকগণ চিন্তিত হয়ে রাজদ্বারে সমবেত হন এবং মহিষীকেই রাজ্যশাসন করার জন্য প্রার্থনা করেন:

> রাজা চ পব্বজ্জম আরোচয়িত্থ
> রট্ঠং পহায় নরবিরিয়সেট্ঠো,
> তুবম পি নো হোহি যথের রাজা,
> অম্হেহি গুত্তা অনুসাস রজ্জন তি। (ঈশানচন্দ্র ১৪২০: ৪৮৭)

অর্থাৎ, বুদ্ধই প্রথম নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা প্রদান করেন। বুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকার সংকুচিত থাকলেও ধর্মীয় আচার-আচরণে নারীর মতামত একেবারে অগ্রাহ্য করা হতো না। এ ছাড়া দুঃখকে বরণ করতে না শিখলে সুখ অর্জন করা সম্ভব হতো না। নারী তার চেতনা ও বোধকে জাগ্রত করেই থেরী বা ভিক্ষুণী হতে এগিয়ে এসেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ভীক পরানে এসেছেন এমন কয়েকজন থেরী হলেন: সুমেধা, সুমনা, মুক্তা, অঞ্ঞতরা প্রমুখ। এ ছাড়াও বুদ্ধের ধর্ম বাণী শ্রবণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন ক্ষেমা, উত্তরা, রোহিণী প্রমুখ। বুদ্ধ নারীজগতের সামনে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য এক মহাসম্ভাবনাময় নব আদর্শের দ্বার খুলে দিলেন। কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কখনো পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে পড়ে, বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে, মৃত্যু শোকে কাতর হয়ে অথবা অন্য কারো প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু নারী ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করে জীবনকে সার্থক করে তুলেছেন।

বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ প্রবর্তিত আদর্শ সমাজব্যবস্থায় নারী কেবল সন্তান প্রজননের যন্ত্রমাত্র বলে গণ্য হতো না, তার ব্যক্তিগত স্বাধীন মতামত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরও মর্যাদা দেওয়া হতো। আজীবন কোনো না কোনো পুরুষের অভিভাবকত্বের আশ্রয়ে থেকে অথবা পরিণয়সূত্রের মাধ্যমে নারী তার জীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে, এই প্রাচীন ধারণাও ক্রমশ পরিবর্তন হলো বৌদ্ধ যুগে নারীদের। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তৎকালীন ভারতীয় নারী উপলব্ধি করল, তাঁদের সম্মুখে এক উচ্চমানের সামাজিক জীবনের দ্বার

উন্মুক্ত রয়েছে (বাণী ১৯৯০: ৪৯)। এ ছাড়াও বুদ্ধ 'সংযুক্ত নিকায়ে' রাজা প্রসেনজিতকে কন্যাসন্তানের গুণ বর্ণনা করে বলেছেন, 'নারী মেধাবিনী, শীলবতী, শ্বশুর-শ্বশ্রুভক্তা ও পতিব্রতা হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। তার যে সন্তান হয়, সে বীর দিকপতি হয়। তার মতো সৌভাগ্যশালীনির পুত্র (রাজা প্রসেনজিতের দৌহিত্র/দৌহিত্রী) রাজ্যশাসনও করে (শীলানন্দ ২০১০: ৫৮)।

নারী-পুরুষ সমতা

বুদ্ধ মানবতা ও মনুষ্যত্বের মহাজাগরণের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি মানুষে মানুষে সমতা, নারী-পুরুষ সমতার কথা বলে গেছেন। তিনি নারীজাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। ব্যক্তি মানুষের পরাজয়কে বুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির পরাভব মনে করতেন। মানবসভ্যতা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দিক থেকে অভাবনীয় সাফল্যের কারণে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অনেক উন্নত। মানব-উন্নয়নের সব সূচকই ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, গড় আয়ু থেকে শুরু করে শিক্ষার হার এমনকি লিঙ্গভিত্তিক সমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীকে নির্যাতনের শৃঙ্খল মুক্ত করে নারী ও পুরুষকে সমতাভিত্তিক সমাজগঠন ও উন্নয়নের সম-অংশীদারিত্বে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলেছেন গৌতম বুদ্ধ। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে নারীর অবদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন বুদ্ধ। এ ছাড়াও তিনি সারন্দদ চৈত্য বৃজিদের সম্মিলিত করে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে[৩] যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেখানেও বুদ্ধ নারীজাতিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর বৃজিগণ বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করে প্রাচীন ভারতে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছেন।

মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বলা হয়েছে, 'যা কুলিত্থিযো, কুল কুমারিযো, তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেন্তীতি' (ধর্ম্মরত্ন ১৯৪১: ৬)। অর্থাৎ, যারা পরের বউ বা কুলকুমারী মেয়েদের জোর করে ধরে এনে নিজের ঘরে বেধে রাখবে না, তাদের প্রতি কখনো সে রকম কোনো অন্যায় আচরণ করবে না, তাদের জীবনে শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে। অবনতির পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় (ধর্ম্মরত্ন ১৯৪১: ৬)। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের দিকে ভারতের অবহেলিত নারী মর্যাদা পেল—যে দিন বুদ্ধের বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে ভিক্ষুণী সংঘ গঠন করা হয়। নারীসমাজ সেদিন থেকে ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজে পুরুষের অনুরূপ অধিকার পেয়েছিল। একজন নারী অনুগত কন্যা, স্নেহময় ভগ্নী, প্রভুভক্ত স্ত্রী ও যুক্তিপরায়ণ মাতা হিসেবে সঠিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। নারী মানবিক সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফুরণ।

ভিক্ষুণী সমাজে আমরা দেখি যে, ক্ষেমা ছিলেন বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবিকা এবং তিনি বুদ্ধের দক্ষিণ পাশে আসন গ্রহণ করতেন। উৎপলবর্ণা ছিলেন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবিকা, তিনিও বুদ্ধের বাম ভাগে আসন গ্রহণ করতেন। অপরিহার্যতা এই কারণে যে, ধর্মের অনুশীলন ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা, সারিপুত্র ও মৌদগলায়ণের সমপর্যায়ের ছিলেন। নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। উভয়কে নিয়েই গঠিত হয় সমাজ, সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সামাজিক সাম্য। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম সমাজগঠন এবং সমাজের নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের উন্নয়ন, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক

উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই নারী-পুরুষের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সুষম ও সমতাভিত্তিক সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। আর নারীকে পুরুষের সাথে সমতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সে জাতি বা দেশের পরিবর্তন যে নিশ্চিত তাতে সন্দেহ নেই। নারীসমাজের অগ্রগতি পুরুষসমাজের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তাই পুরুষদের উচিত নারীজাতিকে জাগিয়ে তোলা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লিঙ্গ-সমতা। আধুনিক সভ্যতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন একটি বৈশ্বিক আহ্বান। যাতে পৃথিবীর সব জায়গার মানুষ সুখে-শান্তিতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। প্রযুক্তি ও উন্নয়নের যুগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীকে বাদ দিয়ে অগ্রগতির আশা করা যায় না। নারী ও পুরুষের সম-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব।

প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আসে অভিনব বিপ্লব। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ভারতীয় সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামি যেমন অনেকখানি দূর হয়েছিল, তেমনিভাবে বুদ্ধ চেয়েছিলেন সামাজিক জীবনে নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধই প্রথম জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও প্রশ্ন যে, নারী কি আজও স্বাধীন? অথচ বুদ্ধ সেই যুগে নারীদের দিয়েছেন সম-অধিকার। তিনি সংঘে দাসী থেকে উপরে রাজমহিষী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নারীদের স্থান দিয়েছেন। যেমন—রাজমহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কুলত্যাগিনী পটাচারা, গণিকা আম্রপালী, স্বামীহীনা-পুত্রহীনা, অন্ন-বস্ত্রের কাঙাল থেরী ছন্দা, দাসী পুন্নিকা একই আসনে উপবিষ্টা। আবার মহা-উপাসিকা বিশাখা এবং চণ্ডালকন্যা মাতঙ্গের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। বুদ্ধ কখনো কাউকে ছোটো করে দেখেননি। উভয়ের প্রতি বুদ্ধের আহ্বান ছিল প্রত্যেকেই নিজের ত্রাণকর্তা। নিজেই নিজের আশ্রয়।

বুদ্ধ নারীদের কতটুকু সম্মান করেছেন তা আমরা 'সিগালোবাদ সূত্রে' দেখতে পাই: 'স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সুন্দর ব্যবহার করা, বৈষয়িক বিষয়ে কর্তৃত্ব দেয়া, যথাসম্ভব বস্ত্রালংকার প্রদান করা, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত না হয়ে নিজ স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা প্রতিটি গৃহপতির কর্তব্য' (শীলভদ্র ২০১৯: ৫৯৭-৫৯৮)। বুদ্ধ নারীদের জন্য এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছেন। এ ছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা গ্রন্থে নারীদের গৌরবের বিষয় কীর্তিত হয়েছে; *সংযুক্ত নিকায়ে* বলা হয়েছে: লৌহবন্ধন, কাষ্ঠ বন্ধন অথবা রজ্জু বন্ধনকে বীর ব্যক্তিগণ দৃঢ় বন্ধন বলেন না। মণিকুণ্ডলসমূহের প্রতি অথবা স্ত্রীপুত্রের প্রতি যে অনুরাগ আসক্তি, তাকেই ধীর ব্যক্তিগণ দৃঢ় বন্ধন বলেন। কারণ এ বন্ধন অধোবাহী শিথিল বটে কিন্তু দুশ্ছেদ্য। (শীলানন্দ ২০১০: ৫৩)

সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরে মাতা মহামায়াদেবী ইহকাল ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। সর্বজ্ঞতা লাভের পর বুদ্ধ স্বীয় মাতাকে মুক্তির পথ প্রদর্শনের মানসে উক্ত দেবলোকে তিন মাস ধর্মদেশনা করেন। বুদ্ধ দেবলোকে মাতাকে মুক্তি দেবার জন্য সেখানে প্রথম অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন। এখানেও বুদ্ধ মাতৃজাতিকে সম্মান দিয়েছেন। নারীদের দিয়েছেন সম্মান ও স্বাধীনতা। বৌদ্ধ ধর্মের নারী শুধু মনোহরই নয়, তাঁরা পুরুষের সমান মানবিক। যেমন অর্হত্ব প্রাপ্তির পর সম্ভ্রান্ত বংশের সুমেধা

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলেছিলেন, 'দেহ দেবস্বভাব সম্পন্ন হলেও তা নশ্বর ... কামে আনন্দের অনুসরণ করো না, এটি যে অশুভ তা অনুধাবন করো ... আকাশ হতে যদি সপ্তবিধ রত্নের বৃষ্টিতে দিগন্ত পূরিত হয়, তা হলেও তৃষ্ণার তৃপ্তি হবে না। মানুষ অতৃপ্ত হয়ে মরবে।' (শীলভদ্র ১৩৩৭: ১৬৬)

বুদ্ধযুগের ধারাবাহিকতায় সমসময়ে নারীর ক্ষমতায়ন

বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করলে কেউ আমাদের কথা ভাববে না' (২০০৬: ২১)। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। জাগ্রত নারীসমাজ পুরুষের অধীনতা ও বৈষম্য অগ্রাহ্য করে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ক্ষমতা মানুষকে সামাজিক মর্যাদা, সম্মান, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি ক্ষমতায়ন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। নারী যদি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে তবে সে নিজেই নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। ফলস্বরূপ নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস পাবে। কেবল মানবেতর অবস্থা থেকে নারী মুক্তি বা উন্নয়নের জন্যই শুধু নয়, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। নারী ক্ষমতায়নকে Ostergaard সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: 'Increasing women's control choices in their lives. It seeks to increase their self-confidence, so they will become more active players in the society.' (Ostergaard 1992:172)

উপসংহার

নারীর মাধুর্য যেমন যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দান করেছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজে নারী দান করেছে তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি। নারীর প্রাণশক্তিতে বলীয়ান সমাজই সুপ্রতিষ্ঠিত; আর প্রাণশক্তির অভাবে সমাজ জীবন্মৃত। জীবনশক্তিতে পরিপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে জীবনের বিমুখতা নেই, আছে জীবনের মহিমোজ্জ্বল মূল্যবোধের স্বীকৃতি। তাই চণ্ডালও ভিক্ষুণী হয়েছে। বুদ্ধ যুগে যে কজন আলোকিত নারী মানুষের কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অন্যতম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবিক ও দায়িত্বসম্পন্ন মহীয়সী নারী। তাঁর সাহসী ভূমিকা বর্তমান প্রজন্মকে প্রেরণা জোগায়, উদ্দীপ্ত করে। মানুষের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথার স্থান ছিল না।

সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে। তবেই সাধিত হবে সমাজের সমূহ কল্যাণ। নারীর অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তার ক্ষমতাহীনতার পরিবর্তন আনতে হবে। আর নারীর অবস্থার উন্নয়নই হলো নারীর বস্তুগত অবস্থা, এবং বস্তুগত অবস্থার উন্নয়নই হলো তার অবস্থান। পরিবারে পুরুষের তুলনায় নারীর বিভিন্ন সুযোগ, অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক অধিকার এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত

গ্রহণের ক্ষমতার প্রকৃতিই নারীর মর্যাদা ও অবস্থানকে নির্দেশ করে। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন দ্বারা বিশ্বকে এমন দিকে চালিত করা উচিত যেখানে নারী এবং পুরুষকে নিশ্চিত করতে হবে যে, সম্পদ সুষমও নিরাপদভাবে ব্যবহৃত হবে। কেবল ঘর নয়, সমগ্র জগৎ হয়ে উঠুক নারীর কর্মক্ষেত্র। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়েছে।

টীকা

১. দেবদহ ছিল কোলিয়ানের একটি জনপদ, যা নেপালের রূপানদেহি জেলা। বুদ্ধ তার সফরের সময় সেখানে অবস্থান করতেন এবং ভিক্ষুদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার করতেন। ভাষ্যানুসারে, এটি ছিল মা (মায়াদেবী) এবং প্রজাপতি গৌতমী এবং তাদের (কোলিয়ান) জন্মের শহর, যারা কপিলাবত্থুর সাকিয়ানদের বিয়ে করেছিলেন।

২. বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে সারনাথ হলো চারটি বৌদ্ধ মহা তীর্থস্থানের অন্যতম। প্রথমটি লুম্বিনী, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। দ্বিতীয়টি হলো বুদ্ধগয়া, যেখানে বুদ্ধের সম্যক জ্ঞানলাভ, তথা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তৃতীয় সারনাথ, বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধসংঘের জন্মস্থান। চতুর্থ কুশিনগর, যেখানে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সারনাথ ভারতের উত্তর প্রদেশের বেনারসে অবস্থিত। যা কাশি থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৩. অপরিহানীয় শব্দের অর্থ সর্বজনীয়, ত্যাগ বা পরিহার না করা। বুদ্ধ নির্দেশিত যে সাতটি নিয়ম অনুসরণ করলে ব্যক্তিগত, সামজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে সেগুলোকে 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' বলা হয়।

সহায়কপঞ্জি

ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১৪২০)। *জাতক* চতুর্থ খণ্ড (অনূদিত)। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী

জিনবংশ ও অন্যান্য (২০১৭)। পবিত্র ত্রিপিটক একাদশ খণ্ড: খুদ্দকনিকায়ে খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু ও প্রেতকাহিনি (অনূদিত)। বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির (১৯৪১)। *মহাপরিনিব্বান সুত্তং* (সংকলিত ও অনূদিত)। চট্টগ্রাম: রাজবিহার

বাণী চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)। *পালি সাহিত্যে নারী* (সন্দীপ নায়ক প্রকাশিত)। কলকাতা

বেলু রানী বড়ুয়া (২০০৪)। *থেরীগাথা*। ঢাকা: বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ

ভিক্ষু শীলভদ্র (১৩৩৭)। *থেরীগাথা* (অনূদিত)। কলকাতা: মহাবোধি বুক সোসাইটি

ভিক্ষু শীলভদ্র (২০১৯)। *পবিত্র ত্রিপিটক* চতুর্থ খণ্ড; সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (অনূদিত)। বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া (১৯৮০)। *পালি সাহিত্যের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী* (আবদুল কাদির সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (২০১০)। *ধাতু সুত্ত* (অনূদিত)। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (২০১০)। *সংযুক্ত নিকায়* (অনূদিত)। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১৯৯৫)। *জাতক সমগ্র* (ভাষান্তরিত ও সম্পাদিত)। কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়

সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া (২০০০)। *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

Bhikkhu J. Kassyap (1956). *Cullavagga* (Edited). India: Nalanda Devanagari Pali Series (NDPS)

H. Oldenberg (1995). *Vinay Pitak* Vol. ii (Edited). London: Pali Text Society

Narada Thera (1993). *The Dhammapada*. Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

T. W. Rhys Davids (1910). *Buddhism*. London: Pali Text Society

Ostergaard (1992). *Evaluating a Decade of World Bank Gender Policy*. Washington D C: The World Bank